একক ২৯ ❒ বাংলা ধ্বনির পরিচয়

গঠন

২৯.১ উদ্দেশ্য
২৯.২ প্রস্তাবনা
২৯.৩ বাংলা স্বরধ্বনি
২৯.৩.১ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত শ্রেণিভেদ
২৯.৪ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি
২৯.৪.১ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত শ্রেণিভেদ
২৯.৫ স্বনিম এবং পূরকধ্বনি/ উপধ্বনি
২৯.৬ সারাংশ
২৯.৭ উত্তরমালা
২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- ভাষার ন্যূনতম একক হিসাবে ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের প্রকারভেদ ধ্বনির নানা বৈচিত্র্য কীভাবে সৃষ্টি হয় তা অনুধাবন করতে পারবেন।
- বাংলা ধ্বনিগুলিকে তাদের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে সজ্জিত করতে পারবেন।

২৯.২ প্রস্তাবনা

ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ধ্বনি বলতে মুখনিঃসৃত বা উচ্চারিত ধ্বনিকেই বোঝানো হয়। প্রতিনিয়িত বাতাস মানুষের নাক ও মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং একইপথে আবার নির্গতও হয়ে আসে। এই নির্গমনের সময় বাতাস ফুসফুস থেকে শ্বাসনালীপথে আমাদের স্বরযন্ত্রের মধ্যে যদি প্রবাহিত হয় এবং তারপর স্বরযন্ত্র থেকে মুখগহ্বরে এসে, বিভিন্ন বাকপ্রত্যঙ্গ যেমন আলজিহ্বা, জিহ্বা, তালু ও মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠাধার ইত্যাদিতে আঘাত করে বা এইগুলির দ্বারা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়, তবে ভাষার ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

মনে রাখবেন, যে কোনো ভাষারই ক্ষুদ্রতম গঠনগত একক হল ধ্বনি (sound)। বিভিন্ন ধ্বনির গুচ্ছবন্ধতা, যা সুনির্দিষ্ট অর্থবহনকারী তাকে আমরা বলি শব্দ (word)। আর এই শব্দের ন্যূনতম যতটুকু অংশ আমরা

উচ্চারণের স্বল্পতম প্রয়াসে বা একেবারে উচ্চারণ করতে পারি, তাকে বলে অক্ষর (Syllabe)। যেমন ধরুন 'কলম' শব্দে 'ক', 'ল', 'ম' ধ্বনি এবং 'ক' ও 'লম্‌' দুটি অক্ষর। সাধারণভাবে ধ্বনি বা অক্ষরের নিজস্ব কোনো অর্থবহনক্ষমতা থাকে না। নানা ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাসেই শব্দ ও বাক্যের উৎপত্তি হয়।

ভাষায় ধ্বনিগত যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার প্রধান কারণ-ফুসফুস থেকে বহির্গামী বাতাসকে আমরা কোন্ প্রক্রিয়ায় মুখবিবরপথে নির্গত করছি তার উপর। সব ভাষাতেই এই কারণে দুটি প্রধান ধ্বনিশ্রেণি উদ্ভূত হয়। এদের একটিকে বলা হয় **স্বরধ্বনি** (Vowel)। এবং অপরটিকে ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)। বাতাস স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করার পর যদি মুখবিবরের মুক্ত পথে বার হয়ে আসে তবে স্বরধ্বনি সৃষ্ট হয়। আর স্বরযন্ত্র থেকে বেরিয়ে বাতাস যদি সঙ্কুচিত বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ পথে চালিত হয়, তবে যে ধ্বনিগুলির সৃষ্টি হয় সেগুলিকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। আসুন, বাংলাভাষার স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে আমরা এবার জানতে চেষ্টা করি।

২৯.৩ বাংলা স্বরধ্বনি

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়গুলি মনে রাখবেন সেগুলি সূত্রাকারে নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আমাদের স্বরযন্ত্রস্থিত দুটি তন্ত্রী নিকটবর্তী অবস্থায় থাকে এবং নিঃশ্বাসবায়ু এদুটিকে ঠেলে, বাধা অপসারণ করে নির্গত হয়। এর ফলে এই তন্ত্রীদুটিতে কম্পন বা অনুরণনের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই স্বরধ্বনিগুলি ঘোষধ্বনি (voiced)।

(খ) মুখবিবরের ভেতর দিয়ে বাতাস বেরোবার সময় তার প্রবাহ থাকে সম্পূর্ণ মুক্ত অর্থাৎ বাতাস কোথাও অবরুদ্ধ হয় না।

(গ) বাতাস নিগর্মনের সময় কোনো বাক্‌প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সংস্পর্শে সঙ্কীর্ণ পথের কারণে ঘষা খায় না।

(ঘ) বাংলাভাষার স্বরধ্বনিগুলি সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের বিবর্তনপথ ধরে আগত। কিন্তু বাংলা বর্ণমালা আমরা নিয়েছি সরাসরি সংস্কৃত থেকে। তাই কথ্য বাংলায় বর্তমানে অপ্রচলিত বহু ধ্বনির লেখ্যরূপ আমাদের বর্ণমালায় এখনও প্রচলিত। যেমন—ঋ, ঌ

বাংলায় প্রচলিত স্বরধ্বনিগুলিকে যদি একটু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন, তবে স্পষ্টতই তাদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করতে পারবেন, ই-ঈ, উ-ঊ এই রকম ধ্বনিযুগ্মগুলিতে দেখুন—প্রথমটি হ্রস্ব এবং দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। অর্থাৎ প্রথণটিতে (ই বা উ) হ্রস্ব উচ্চারণ ও দ্বিতীয়টিতে (ঈ বা ঊ) দীর্ঘ উচ্চারণ বিহিত। কিন্তু উচ্চারণের এই বিধি বানানের চেহারায় ধরা পড়লেও আমাদের দৈনন্দিন কথ্যবাংলায় তার কোনো প্রয়োগ বৈষম্য নেই।

আবার আরও একটি বিষয় দেখুন—'ঐ' ও 'ঔ' ধ্বনিদুটি আসলে দুটি অন্যধ্বনির যৌগিক রূপ, যেমন—ঐ = ও + ই এবং ঔ = ও + উ। ঔ লেখার সময় না হলেও 'ঐ' লেখার সময় তাই দুরকম প্রবণতাই আমাদের চোখে পড়ে 'ঐ' ও 'ওই'।

এই অবস্থায় বাংলা স্বরধ্বনি নিরূপণে বা মৌলিক দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—

(১) যে ধ্বনিগুলি একটিমাত্র নির্দিষ্টধ্বনি বা মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal vowel)।

(২) যে ধ্বনিগুলি একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনি দ্বারা গঠিত বা যৌগিক স্বরধ্বনির (Diphthong)। এগুলিকে সন্ধিস্বর নামেও অভিহিত করা হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনি ঃ

বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মোট সাতটি—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। এই শেষোক্ত স্বরধ্বনিটিকে এবার লক্ষ্য করুন। এটি সংস্কৃতে ছিল না, এটি বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ প্রবণতাজাত স্বরধনি। কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত বর্ণমালায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বর্ণচিহ্ন ছিল না তাই এখনও এটিকে লিখিত চেহারায় প্রকাশ করতে কখনও এ (এখন), কখনও অ্যা (অ্যাঙ্গোলা), কখনও বা 'অ' বা 'আ' (অকাদেমী/আকদেমী) ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই।

যৌগিক স্বরধ্বনি / সন্ধিস্বর ঃ

একাধিক মৌলিক স্বরধ্বনির সমবায়ের ফলে সৃষ্ট এই জাতীয়ধ্বনির লিখিত বর্ণচিহ্ন হিসাবে আমরা পাই মাত্র দুটিকে—'ঐ', 'ঔ'। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে বাংলায় পঁয়ত্রিশটিরও বেশি যৌগিক স্বরধ্বনি প্রচলিত। এগুলি সবসময়ই যে দুটি স্বরধ্বনি দ্বারা গঠিত, তা নয়, তিনটি, চারটি বা পাঁচটি স্বরধ্বনি দ্বারাও যৌগিকস্বর গঠিত হতে পারে। তবে দ্বিস্বরবিশিষ্ট যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যাই বেশি ?

দ্বিস্বরধ্বনি—অএ (নয়), অও (চওড়া), আই (বাইরে), আএ (খায়), আও (নাও), আউ (লাউ), ইই (নিই), ইএ (বিয়ে), ইআ (দিয়া), ইও (নিও), ইউ (শিউলি), এ্যায় (ব্যয়) ইত্যাদি।

ত্রিস্বরধ্বনি—আইও (যাইও), ইএই (নিয়েই), উআও (শুনাও) ইত্যাদি।

চতুস্বরধ্বনি—আওআএ (খাওয়ায়), এওআই (দেওয়াই) ইত্যাদি।

পঞ্চস্বরধ্বনি—আওআইও (খাওয়াইও)।

এই যে সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির অস্তিত্ব আমরা পেলাম, এই সাতটি কিন্ত পরস্পরের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, যে কারণে তাদের উচ্চারিতরূপ ও প্রকাশ বর্ণচিহ্ন ভিন্ন। এইবারে আসুন, আমরা সেই বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কারণ অনুসন্ধান করি।

২৯.৩.১ বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য ও তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

স্বরধ্বনিগুলি শ্রুতিগোচর যে ভিন্নতা তারজন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বাক্‌প্রত্যঙ্গের নানা অবস্থান। জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ের আকৃতি এবং অবস্থানই স্বরধ্বনিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরূপ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এইবার দেখুন, কীভাবে জিহ্বার বিভিন্ন অবস্থান, ওষ্ঠাধরের আকৃতি এবং এর ফলে মুখবিবরের আয়তনগত ভিন্নতা স্বরধ্বনির

স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে চলে। বিষয়টিকে আমরা কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে এইভাবে সাজাতে পারি—

(ক) জিহ্বার মুখবিবরের সম্মুখ কিংবা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান।

(খ) জিহ্বার মুখবিবরের ঊর্ধ্ব, মধ্য বা নিম্নভাগে অবস্থান।

(গ) ওষ্ঠাধরের কুঞ্চিত বা প্রসারিত অবস্থা।

(ঘ) মুখবিবরের সংবৃত বা বিবৃত আয়তন।

জিহ্বার সম্মুখ বা পশ্চাদভাগে অবস্থান ঃ

'ই', 'এ', 'অ্যা'—এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের সম্মুখভাবে অবস্থান করে। এই কারণে এই স্বরধ্বনিগুলি সম্মুখ স্বরধ্বনি নামেও (Front vowel) পরিচিত।

আবার 'উ', 'ও', 'অ' এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের পশ্চাদভাগে আকর্ষিত অবস্থায় থাকে। তাই এগুলি পশ্চাদবস্থিত স্বরধ্বনি (Back vowel) নামেও পরিচিত।

'আ' ধ্বনি উচ্চারণপর্বে জিহ্বার অবস্থান পুরোপুরি সম্মুখভাগে নয়, আবার পশ্চাতেও আকর্ষিত নয়, এমন মধ্যপর্বে থাকে। তাই এটিকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (Central vowel) বলা হয়।

জিহ্বার ঊর্ধ্ব, মধ্য বা নিম্নভাগে অবস্থান ঃ

'ই', 'উ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের সর্বাপেক্ষা উচ্চে অবস্থান করে। এই কারণে এই দুটিকে ঊর্ধ্ব স্বরধ্বনি (High vowel) বলা হয়। 'এ', 'ও' উচ্চারণের সময় জিহ্বা আর একটু নীচে নেমে আসে বলে এদুটিকে বলা হয় উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High-mid vowel)। 'অ্যা', 'অ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা অনেকখানি নীচে নেমে আসে এবং সে কারণে এই দুই ধ্বনি নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি (Low-mid vowel) হিসাবে পরিচিত। 'আ' ধ্বনি উচ্চারিত হয় জিহ্বার সর্বাধিক নিম্ন অবস্থানে। তাই এটি নিম্ন স্বরধ্বনি (Low vowel)।

ওষ্ঠাধরের কুঞ্চিত বা প্রসারিত অবস্থা ঃ

সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলি অর্থাৎ 'ই', 'এ' 'অ্যা' উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধারের আকৃতি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। তাই এগুলিকে প্রসৃত স্বরধ্বনি (Spread vowel) বলে। আবার 'উ', 'ও', 'অ'—এই পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধার সংকুচিত হয়ে বর্তুল বা গোলাকার প্রাপ্ত হয়। এই গোলাকৃতির ওষ্ঠাধারের কারণে এই স্বরধ্বনিগুলিকে বলা হয় বর্তুল বা কুঞ্চিত স্বরধ্বনি (Rounded vowel)।

মুখবিবরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

এইক্ষেত্রে 'ই', 'উ' উচ্চারণকালে মুখবিবর পুরোপুরি সংবৃত, 'এ', 'ও' উচ্চারণের সময় খানিকটা সংবৃত, 'এ্যা' 'অ' উচ্চারণে প্রায় বিবৃত এবং 'আ' ধ্বনির উচ্চারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিবৃত বা উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। মুখবিবরের এই খোলা থাকার আয়তনের উপর নির্ভর করেই এই চারটি ক্ষেত্রে উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে—সংবৃত স্বর (Closed vowel), অর্ধ-সংবৃত স্বর (Half-closed vowel), অর্ধ বিবৃত স্বর (Half-open vowel) এবং বিবৃত স্বর (Open vowel)।

যে চারটি পর্বের কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেই পর্ব অনুযায়ী বাংলার সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বর্গীকরণ করতে পারি—

	সম্মুখবস্থিত (Front)	কেন্দ্রীয় (Central)	পশ্চাদবস্থিত (Back)
	প্রসৃত (Spread)	বিবৃত (Open)	বর্তুল (Round)
উচ্চ (High) .... সংবৃত (Closed)	ই		উ
উচ্চ-মধ্য (High-mid) .... অর্ধ-সংবৃত (Half-closed)	এ		ও
নিম্ন-মধ্য (Low-mid) .... অর্ধ-বিবৃত (Half-open)	অ্যা		অ
নিম্ন (Low) .... বিবৃত (Open)		আ	

২৯.৪ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

মুখবিবরের যে কোনো জায়গায় যদি বাক্প্রত্যঙ্গগুলির কোনো কোনোটির পরস্পর স্পর্শ বা সংলগ্নতার কারণে, শ্বাসবায়ু নির্গত হবার পথে কোনো বাধা পায়, তবে যে ধ্বনিগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলিকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এই ধ্বনিগুলির ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিষয় মনে রাখবেন—

(ক) ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ আংশিক বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে।

(খ) নির্গম পথের বাধা অপসারণ করতে শ্বাসবায়ুকে আঘাত বা ঘর্ষণ করতে হয়।

(গ) বিভিন্ন বাক্প্রত্যঙ্গ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় হয় পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে, নয়তো এতটাই কাছাকাছি থাকে, যাতে শ্বাসবায়ুর সচ্ছন্দ নির্গমনে বাধা সৃষ্টি হয়।

(ঘ) স্বরধ্বনির মতোই ব্যঞ্জনধ্বনিতেও বর্ণমালা সরাসরি সংস্কৃত থেকে গৃহীত। তাই এখানেও অনেক ধ্বনিরই অস্তিত্ব আমাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে না থাকলেও লিখিত বর্ণচিহ্নে বর্তমান। যেমন—'জ' 'য' আমাদের কাছে অভিন্ন, 'ঙ' 'ং' ও একইভাবে আমরা উচ্চারণ করি।

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির স্বরধ্বনির মতোই নানা শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে পারে। এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি মানদণ্ড প্রাথমিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে—

(১) ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সক্রিয় বাক্‌প্রত্যঙ্গের ভিন্নতা।

(২) ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমনের প্রকৃতি।

(৩) ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর নির্গমপথ।

আসুন, এবার আমরা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে এই তিনটি মাত্রা প্রয়োগে বিভিন্ন শ্রেণিতে সাজিয়ে চিনে নেবার চেষ্টা করি।

২৯.৪.১ বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবৈচিত্র্য ও তজ্জনিত শ্রেণিভেদ

বাংলা বর্ণমালার প্রথম পঁচিশটি বর্ণের উচ্চারিত ধ্বনিরূপকে স্পর্শধ্বনি বলা হয়। কারণ এগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বার কোনো না, কোনো অংশ কণ্ঠ, তালু বা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে। এগুলিকেও আবার উচ্চারণস্থানের এই ভিন্নতা অনুযায়ী পাঁচটি বর্গে শ্রেণিবন্ধ করা হয়। এবার লক্ষ্য করুন কীভাবে এই বিন্যাসের প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয়েছে—

(১) **ক-বর্গ বা কণ্ঠ্যধ্বনি**—জিহ্বার মূল বা পশ্চাদভাগ দ্বারা গলার কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এই পাঁচটি ধ্বনি বর্গভুক্ত।

(২) **চ-বর্গ বা তালব্য ধ্বনি**—জিহ্বার মধ্যভাগ দিয়ে তালুর সামনের কঠিন অংশ স্পর্শ করে এই বর্গের চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

(৩) **ট-বর্গ বা মূর্ধন্যধ্বনি**—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ-এই পাঁচটি ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে উলটিয়ে তালুর কঠিন অংশ যাকে মূর্ধা বলা হয়, সেই অংশ স্পর্শ করা হয়। তাই এগুলির নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

(৪) **ত-বর্গ বা দন্ত্যধ্বনি**—জিহ্বার অগ্রভাগকে সামনে প্রসারিত করে দাঁতের পিছনের অংশে স্পর্শ করিয়ে এই বর্গে পাঁচটি ধ্বনিকে উচ্চারণ করা হয়। যেমন—ত, থ, দ, ধ, ন।

(৫) **প-বর্গ ওষ্ঠ্যধ্বনি**—ওষ্ঠাধর পরস্পরের সংলগ্ন অবস্থায় থাকলে শ্বাসবায়ু জোরে ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিয়ে নির্গত হয়। এইভাবে উচ্চারিত প, ফ, ব, ভ, ম ধ্বনিগুলি ওষ্ঠ্যধ্বনি হিসাবে পরিচিত।

এই যে পঁচিশটি ধ্বনি দেখলেন, মনে রাখবেন—এগুলির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই এগুলি স্পৃষ্টধ্বনি নামে (Stop) পরিচিত।

এরপর আমরা পাই য, র, ল, ব যার মধ্যে 'য' ও 'ব' আমাদের বর্গীয় 'জ' ও 'ব'-এর সঙ্গে উচ্চারণে একাকার হয়ে গেছে। বাকি থাকে 'র' ও 'ল'। এই দুটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ যথাক্রমে দন্তমূল ও দন্ত স্পর্শ করে থাকে ও শ্বাসবায়ু জিহ্বার দুইপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। তাই এগুলিকে পার্শ্বিক ধ্বনি (Latteral) বলা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে আসে তিনটি শ, ষ, স এবং 'হ'। এগুলির মধ্যে 'শ' উচ্চারণে জিহ্বাগ্র তালু, 'ষ' উচ্চারণে মূর্ধা এবং 'স' উচ্চারণে দন্তমূল স্পর্শ করে এবং বায়ুপ্রবাহ এক সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে বাইরে আসে। তাই এগুলিকে উষ্মধ্বনি বলা হয়। এদের মধ্যে 'হ' ধ্বনিটির উৎপত্তিস্থল কণ্ঠনালী।

ড় ও ঢ় ধ্বনিদুটি উচ্চারণকালে জিহ্বাগ্র উলটিয়ে যথাক্রমে মূর্ধা এবং তালুর কঠিন অংশে আঘাত করতে হয়। তাই এ দুটি তাড়নাজাত ধ্বনিরূপে (Flapped) পরিচিত।

'য়' ধ্বনিটি 'ইঅ' রূপে উচ্চারিত হয়। তাই এটিকে অর্ধস্বর বলা হয়। 'ং' বাংলায় 'ঙ' ধ্বনির সঙ্গো সমীকৃত, তাই এটিকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'ঃ' ধ্বনিটি সংস্কৃতে থাকলেও বাংলায় প্রায়ই এটি অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত বা অবলুপ্ত (দুঃখ > দুক্‌খ, কার্যতঃ > কার্যত)। ঁ(চন্দ্রবিন্দু) প্রকৃতপক্ষে স্বরধ্বনির অনুনাসিক উচ্চারণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তাই এই কয়টি ধ্বনি বাংলা ভাষায় পূর্ণ ব্যঞ্জনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আমরা বলতে পারি না।

এইবার লক্ষ করুন, যে পাঁচটি বর্গের কথা আমরা আলোচনা করলাম তার প্রত্যেকটির ধ্বনিগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষ্য বর্তমান। যেমন—

(১) প্রতিটি বর্গের পঞ্চম ধ্বনিটি নাসিক্য। অর্থাৎ এগুলির উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত হয়। যেমন—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

(২) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিগুলির তুলনায় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিগুলি গাম্ভীর্যপূর্ণ ও নাদযুক্ত। তাই এই কম গাম্ভীর্যের মৃদু ধ্বনিগুলিকে বলা হয় অমোঘ ধ্বনি এবং নাদযুক্ত গম্ভীর ধ্বনিগুলিকে বলা হয় সঘোষ ধ্বনি। ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি অঘোষ। গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি সঘোষ।

(৩) বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিতে প্রাণ বা নিশ্বাস (হ-কার জাতীয় ধ্বনি) যুক্ত হয়ে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই কারণে প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণধ্বনি ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণধ্বনি। ক, গ, ট, ড, প, ব ইত্যাদি অল্পপ্রাণ। অন্যদিকে খ, ঘ, ঠ, ঢ, ফ, ভ ইত্যাদি মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অর্থাৎ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের তিনটি পর্যায়ভুক্ত বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে—উচ্চারণস্থান, শ্বাসবায়ুর গতিপথ (নাসাপথ বা মুখবিবর) এবং শ্বাসবায়ু নির্গমনের প্রকৃতি (পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত বা আংশিক বাধাপ্রাপ্ত)। তবে লক্ষ করে দেখুন, ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধর।

২৯.৫ স্বনিম ও পুরকধ্বনি / উপধ্বনি

এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয়ই একটি বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছেন যে প্রত্যেকটি ধ্বনির একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চারণরীতি আছে, যে কারণে সেটি অন্য ধ্বনির থেকে পৃথক রূপে শ্রুতিগ্রাহ্য হচ্ছে।

এবার লক্ষ করুন, কোনো ধ্বনি শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হবার সময় অন্যধ্বনির সান্নিধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে (শব্দের আদি, মধ্য বা অন্ত) থাকতে বাধ্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় এই আবস্থানিক কারণ বা অন্যধ্বনির প্রতিবেশ কোনো বিশেষ একটি ধ্বনিকে খুব সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে এবং তার উচ্চারণপদ্ধতি বদলে দেয়। একটি দৃষ্টান্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন 'আলতা' শব্দটি উচ্চারণ করছেন, দেখবেন 'ল' ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বাগ্র তখন দন্ত স্পর্শ করছে। আবার যদি 'উলটা' শব্দটি বলতে যান, তখন খেয়াল করুন জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করছে

মূর্ধা। এর কারণ ‘ল’ ধ্বনির ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধ্বনিপ্রতিবেশ—‘আলতা’য় ‘দন্ত্য’ ধ্বনি ‘ত’ এর এবং ‘উলটা’য় মূর্ধন্যধ্বনি ‘ট’-এর। অর্থাৎ ‘ল’-এর দুটি ধ্বনিরূপ পাচ্ছেন—দন্ত্য ‘ল’ ও মূর্ধন্য-‘ল’।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছেন যে ‘ল’-এর উচ্চারণস্থান দন্ত। এক্ষেত্রে দন্ত ‘ল’ ধ্বনিটিকে আমরা বলব মূলধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme)। একে ধ্বনিমূলও বলা হয়। আর এই ‘ল’ স্বনিমের যে নানা উচ্চারণ বৈচিত্র্য তাকে বলব পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি (Allophone) যাদের সহধ্বনি বা বিস্বন নামেও চিহ্নিত করা হয়। যে কোনো ধ্বনিমূল বা স্বনিমেরই এক বা একাধিক উপধ্বনি থাকতে পারে।

২৯.৬ সারাংশ

এতক্ষণ আমরা বাংলা স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। সামগ্রিক পর্যালোচনায় বাংলাভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহ সম্পর্কে যে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হল, সেগুলি এইপ্রকার—

(ক) স্বরধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর নির্গমপথে কোথাও বাধা সৃষ্টি হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে শ্বাসবায়ু আংশিক বা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(খ) স্বরধ্বনিগুলি সবই সঘোষ কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনি সঘোষ ও অঘোষ—উভয় প্রকারেরই হয়।

(গ) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি—উভয় ধ্বনির উচ্চারণকালেরই বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর এই বাক্‌প্রত্যঙ্গ দুটি।

(ঘ) সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করার কারণে আমাদের লিখিত ধ্বনিরূপে যতগুলি ধ্বনির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, উচ্চারিত রূপে ধ্বনির সংখ্যা তার চেয়ে কম। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সাতটি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে ত্রিশটিতে এই সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

(ঙ) স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ধ্বনির সমবায়ে অর্থপূর্ণ শব্দের উৎপত্তি। আর এই শব্দগুলির যতটুকু অংশ আমাদের উচ্চারণের স্বল্পতম প্রয়াসে তৈরি হয় তাকে বলা অক্ষর।

২৯.৭ অনুশীলনী

১। **নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন ঃ**

ধ্বনি ও বর্ণ, সংবৃত ও বিবৃত স্বরধ্বনি, স্পৃষ্ট ও উষ্ম ব্যঞ্জন, মৌলিক ও যৌগিক স্বরধ্বনি, সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি,

২। **নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলিতে কোন্ কোন্ ধ্বনির উচ্চারণ হয় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করুন ঃ**

(ক) মুখবিবরে কোথাও বাধাসৃষ্টি না করে ও ওষ্ঠাধর গোলাকৃতি করে।

(খ) মুখবিবরে কোথাও না কোথাও বাধাসৃষ্টি করে এবং শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত করে।

(গ) জিহ্বার অগ্রভাগ উলটিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করে।

৩। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

(ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।

(খ) বর্গীয় অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ এবং সঘোষ-অঘোষ ধ্বনি।

(গ) বাংলা বর্ণমালাভুক্ত কিন্তু উচ্চারণে অপ্রচলিত ধ্বনিসমূহ।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসমূহ বিশদ আলোচনা করুন ঃ

(ক) বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণিভেদ।

(খ) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ।

(গ) বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক তুলনা।

২৯.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. রামেশ্বর শ—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।

২. ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত।

৩. ড. পবিত্র সরকার—ভাষা জিজ্ঞাসা।